কিন্তু দেশের জনগণ মালিক হবে না এ কেমন ব্যবসা?

লেখক: মেসবাহ উদ্দিন খান মিঠু | প্রকাশিত: 17 October 2026, 02:59 PM | বিভাগ: ফিচার

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড বাংলাদেশে এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ব্যবসা করছে। ১৯০৫ সাল তথা তৎকালীন ব্রিটিশ শাসনামল থেকে তারা ব্যবসা সম্প্রসারণ করে আসছে। এইচএসবিসি'র ইতিহাসও বাংলাদেশে দীর্ঘ, এর পূর্বসূরি মার্কেন্টাইল ব্যাংক-এর কার্যক্রমের ইতিহাস ১৯৫১ থেকে, আর এইচএসবিসি নামে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু হয় ১৯৯৬ সালে। সিটি (সিআইটিআই) বাংলাদেশে ১৯৮৭ সাল থেকে করপোরেট ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যাংকিং করছে। মেটলাইফ বা পুরোনো আলিকো বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষের কাছ থেকে বিভিন্ন বিমা পলিসির মাধ্যমে হাজার হাজার কোটি টাকা প্রিমিয়াম হিসেবে সংগ্রহ করে, শত শত কোটি টাকা মুনাফা করছে। সেই মুনাফার একটি বড় অংশ তারা নিজেদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ এইসব এমএনসি সমূহের ব্যবসার গ্রাহক হবে, কিন্তু তাঁদের মুনাফার অংশীদার হবে না। এই তালিকায় বিদেশি ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ফার্মাসিউটিক্যালস ও তেল কোম্পানির যথেষ্ট পরিমাণে উদাহরণ দেওয়া যায় যারা এ দেশে শত শত কোটি টাকার ব্যবসা ও মুনাফা করছে এবং পরবর্তীতে সেই মুনাফা নিজ দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে।

শুধু ব্যাংক নয়, ম্যানুফেকচারিং কোম্পানিগুলোর মধ্যে ইউনিলিভার, নেসলে, বিএটি, শেভরন, বাটা, রেকিট, ম্যারিকো সহ অনেক বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান দীর্ঘদিন ধরে বাংলাদেশের বাজারে ব্যবসা করছে। বাংলাদেশের বিশাল ভোক্তা বাজার, মানুষের সঞ্চয়, ব্যাংকিং ব্যবস্থা, অবকাঠামো ও শ্রমশক্তিকে ব্যবহার করে এসব প্রতিষ্ঠান এখানে দুর্দান্ত ব্যবসা করছে এবং বিরাট অঙ্কের মুনাফা করছে। শুধুমাত্র

স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ২০২৫ সালে প্রফিট করেছিল ২,৮০০ কোটি টাকা। কিন্তু তাদের অধিকাংশই দেশের পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত নয়। ব্যবসা করার অধিকার তাদের অবশ্যই আছে। প্রশ্নটি অন্য জায়গায়। এই বিপুল অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অংশীদারিত্ব কোথায়? সাধারণ মানুষ তাদের ব্যবসার শ্রেফ একজন গ্রাহক, কিন্তু মালিক নয়। সেই মুনাফায় বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ এবং দেশীয় বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণ থাকবে না কেন? আর এখানেই পুঁজিবাজারের গুরুত্ব।

একটি কোম্পানি যদি বাংলাদেশে ব্যবসা করে, বাংলাদেশের বাজার থেকে আয় করে এবং বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে অর্থায়ন নেয়, রাষ্ট্রের অবকাঠামো ব্যবহার করে তাহলে সেই কোম্পানির মালিকানায় বাংলাদেশের সাধারণ বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকা উচিত। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হলে সাধারণ মানুষ শেয়ার কিনে সেই ব্যবসার অংশীদার হতে পারে। একই সঙ্গে কোম্পানির আর্থিক হিসাব, সম্পদ, ঋণ, মুনাফা ও পরিচালনা সম্পর্কে অধিকতর স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা তৈরি হয়। দুঃখজনকভাবে সত্য বাংলাদেশে ২০১০ সালে ৫০ কোটি টাকার বেশি পরিশোধিত মূলধন হলে আইপিও’র বিধান ছিল, কিন্তু ২০১৯ সালে সেই নোটিফিকেশন বাতিল করা হয়।

একটি কোম্পানি ব্যাংক থেকে বিপুল ঋণ নেবে, ব্যবসা করবে, মুনাফা করবে কিন্তু পুঁজিবাজারে আসবে না। অথচ তালিকাভুক্ত হলে সাধারণ জনগণও সেই ব্যবসার অংশীদার হতে পারত এবং কোম্পানির ওপর বাজারভিত্তিক অতিরিক্ত নজরদারি তৈরি হতো। আমাদের অর্থায়ন ব্যবস্থার এখানেই বড় দুর্বলতা। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ব্যবসা এটাই যেন নিয়ম। অথচ হওয়া উচিত ছিল পুঁজিবাজার ও ব্যাংক দুই ব্যবস্থার সমন্বিত ব্যবহার।

এখানে পাবলিক ইন্টারেস্ট কোম্পানি নীতিমালা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ, বড় এবং অর্থনীতিতে প্রভাবশালী কোম্পানিগুলোকে পুঁজিবাজারে আনার বাধ্যবাধকতা তৈরি করা গেলে শুধু শেয়ারবাজারের আকারই বাড়বে না, সাধারণ মানুষও দেশের বড় বড় ব্যবসা ও শিল্পের সম্পদ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় অংশীদার হতে পারবে। আমরা বহুজাতিক কোম্পানির বিরুদ্ধে নই। বরং তারা বাংলাদেশে আসুক, বিনিয়োগ করুক, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করুক, প্রযুক্তি আনুক এবং মুনাফা করুক এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু একই সঙ্গে প্রয়োজন স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, সুশাসন এবং যেখানে প্রযোজ্য সেখানে স্থানীয় বিনিয়োগকারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ।

বাংলাদেশের অর্থনীতি যদি সত্যিই অন্তর্ভুক্তিমূলক করতে হয়, তাহলে শুধু কয়েকজন উদ্যোক্তা বা ব্যবসায়ী বড়লোক হবেন এমন অর্থনীতি নয়; সাধারণ মানুষও যেন দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মালিকানা ও সম্পদ সৃষ্টির অংশীদার হতে পারেন, সেই ব্যবস্থা করতে হবে। একটি বিকাশমান

অর্থনীতির লক্ষ্য হওয়া উচিত শুধু ব্যাংকমুখী অর্থনীতি নয়, শক্তিশালী পুঁজিবাজারভিত্তিক অর্থনীতি। শুধু গ্রাহক নয়, সাধারণ মানুষকে বিনিয়োগকারী ও অংশীদার করা।

বাংলাদেশের পুঁজিবাজার ও ব্যাংকিং ব্যবস্থার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করতে গেলে ইসলামী ব্যাংকসহ অন্যান্য কয়েকটি ব্যাংকের ঋণ কেলেঙ্কারি একটি গুরুত্বপূর্ণ কেস স্টাডি হতে পারে। এস আলম ও তাঁর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিপুল পরিমাণ ঋণ নেওয়া এবং সেই অর্থের বড় অংশ বিদেশে পাচারের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়েছে। বিশেষ করে অনেক ঋণ দেওয়া হয়েছিল তুলনামূলকভাবে নতুন ও নামসর্বস্ব কোম্পানির নামে। এখানেই আমাদের জন্য সবচেয়ে বড় শিক্ষা হচ্ছে যদি কোনো কোম্পানি শত শত বা হাজার হাজার কোটি টাকার ঋণ নিতে চায়, তাহলে ওই কোম্পানির মালিকানা, সম্পদ, ব্যবসা, আর্থিক সক্ষমতা ও প্রকৃত অস্তিত্ব সম্পর্কে একটি শক্তিশালী জনসাধারণের নজরদারি থাকা জরুরি।

পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির অন্যতম বড় সুবিধা এখানেই। একটি কোম্পানি তালিকাভুক্ত হলে তার আর্থিক হিসাব, সম্পদ, দায়, মালিকানা, পরিচালনা পর্ষদ ও ব্যবসায়িক কার্যক্রম নিয়মিতভাবে প্রকাশ করতে হয়। নিরীক্ষা, ডিসক্লোজার এবং রেগুলেটরী ওভারসাইট-এর কারণে একটি শেল বা নামসর্বস্ব কোম্পানির পক্ষে বিপুল অর্থ সংগ্রহ করা তুলনামূলকভাবে কঠিন হয়ে যায়। তাই একটি নীতিগত প্রশ্ন সামনে আসছে কোনো কোম্পানি যদি নির্দিষ্ট সীমার বেশি বৃহৎ ব্যাংকঋণ নিতে চায়, তাহলে তাকে আগে পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হওয়ার শর্তের আওতায় আনতে হবে । আমার মতে, বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা উচিত। এর অর্থ এই নয় যে প্রতিটি কোম্পানিকে ছোট অর্থায়নের জন্যও শেয়ারবাজারে আসতে হবে। বরং বৃহৎ ঋণগ্রহীতা কোম্পানির জন্য একটি নির্দিষ্ট সীমা নির্ধারণ করা যেতে পারে। সেই সীমার বেশি ঋণ নিতে হলে কোম্পানিকে প্রথমে নির্দিষ্ট তথ্য প্রকাশ, নিরীক্ষা, মালিকানার স্বচ্ছতা এবং পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্তির প্রয়োজনীয় শর্ত পূরণ করতে হবে।

নীতিটি হতে পারে বড় ঋণ নেওয়ার ক্ষেত্রে শুধু ব্যাংকের ঋণযোগ্যতা যাচাই যথেষ্ট নয়; কোম্পানির মালিকানা, আর্থিক অবস্থা ও ব্যবসায়িক কার্যক্রমের ওপর পুঁজিবাজারভিত্তিক জনসমীক্ষাও থাকা উচিত। এ ধরনের ব্যবস্থা চালু হলে একদিকে ব্যাংকের বড় ঋণের ঝুঁকি কমবে, অন্যদিকে জনগণের অর্থের নিরাপত্তা বাড়বে। একই সঙ্গে পুঁজিবাজারে ভালো ও বড় কোম্পানির তালিকাভুক্তিও বাড়বে। ইসলামী ব্যাংকসহ সাম্প্রতিক ব্যাংকিং সংকটের সবচেয়ে বড় শিক্ষা হলো বিপুল ব্যাংকঋণ যদি স্বচ্ছ মালিকানা, শক্তিশালী ডিসক্লোজার এবং জনগণের কাছে জবাবদিহিতার বাইরে থাকে, তাহলে সেই অর্থের অপব্যবহার ও পাচারের ঝুঁকি থেকেই যায়। তাই এখন সময় এসেছে মানি মার্কেট বা ব্যাংক ও পুঁজিবাজারকে আলাদা দুটি সত্ত্বা হিসেবে না দেখে একটি সমন্বিত ফাইন্যান্সিয়াল ইকোসিস্টেম হিসেবে দেখার। বৃহৎ ঋণের ক্ষেত্রে পুঁজিবাজারকে অন্তর্ভুক্ত করা শুধু শেয়ারবাজার উন্নয়নের বিষয় নয়, এটি ব্যাংকের অর্থ, আমানতকারীর অর্থ এবং দেশের জনগণের অর্থ সুরক্ষারও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা হতে পারে।

রাষ্ট্রীয় কোম্পানিকেও পুঁজিবাজারের জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। একইভাবে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন ম্যানুফ্যাকচারিং ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানকেও পাবলিক লিস্টিং-এর আওতায় আনা যেতে

পারে। এর মাধ্যমে এসব প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা, দক্ষতা ও গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা সম্ভব। একটি কোম্পানি পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত হলে তাকে নিয়মিত বার্ষিক প্রতিবেদন, নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরণী, এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রকাশ করতে হয়। পাশাপাশি স্বতন্ত্র পরিচালক এবং সাধারণ শেয়ারহোল্ডারদের প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে পরিচালনা পর্ষদের ওপরও বাড়তি জবাবদিহিতা তৈরি হয়।

একটি প্রাণবন্ত ও শক্তিশালী পুঁজিবাজার গড়ে তুলতে তাই শুধু বেসরকারি ভালো কোম্পানিকে নয়, জনস্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় ও সরকার-নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলোকেও ধীরে ধীরে পুঁজিবাজারে নিবন্ধন ও লেনদেনের আওতায় আনা প্রয়োজন। এটি শুধু পুঁজিবাজার সম্প্রসারণের বিষয় নয়; এটি হতে পারে কর্পোরেট সুশাসন, স্বচ্ছতা এবং অর্থনৈতিক ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

সরকারের সঠিক ও দূরদর্শী নীতি, কার্যকর আইন প্রয়োগ এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলোর দৃঢ় সদিচ্ছা থাকলে রাষ্ট্রীয় ও বৃহৎ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকে পুঁজিবাজারের সঙ্গে যুক্ত করে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি অধিকতর স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক ও সুদৃঢ় ভিত্তি তৈরি করা সম্ভব। পুঁজিবাজারকে শুধু বিনিয়োগের বাজার হিসেবে নয় রাষ্ট্র ও অর্থনীতির জবাবদিহিতার একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবেও দেখতে হবে।

© 2026 আপনার নিউজ পোর্টাল। সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।
এই প্রতিবেদনটি আমাদের ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা হয়েছে।